জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ২৯ অক্টোবর, ২০১০-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

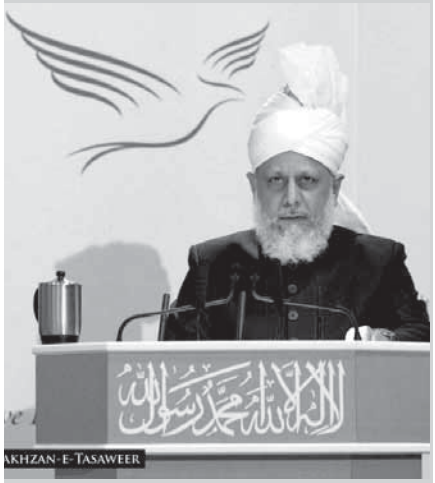

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ *
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين

নতুন নতুন আবিস্কারাদী কিছু মন্দ বিষয় বিস্তারেও বড় ভূমিকা রাখছে। চিন্তা ভাবনা না করেই কিছু লোক নিজেও এবং নিজেদের বাচ্চাদেরও এসব মন্দ বিষয়ে জড়িয়ে ফেলে। অথচ তাদের ধারণাই নেই যে এর প্রকৃত তাৎপর্য কী?

এর অন্তর্নিহিত মর্ম কী? দেখাদেখি সমাজের পিছু পিছু চলে এরা এসব কাজ করতে শুরু করে। আঁ হযরত (সা.)-এর শেখানো এ দোয়ার দিকে যদি আমাদের দৃষ্টি থাকে,'হে আল্লাহ্! আমরা অজ্ঞতা বশতঃ কিছু কাজ করে ফেলি, সেগুলো করা থেকেও আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি'।

তাশাহ্হুদ, তা'উয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) এ আয়াত পাঠ করেন-

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا ۝

(সূরা আন-নিসা ঃ ৪৯)

এ আয়াতের অনুবাদ হচ্ছে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করা হলে তা ক্ষমা করবেন না, এছাড়া যাকে চান তার অন্য সব (গুণাহ) ক্ষমা করবেন। আর যে আল্লাহ্ তাআলার সাথে অংশীদার নির্ধারণ করে, নিশ্চয়ই সে অনেক বড় গুণাহ করে। নতুন নতুন আবিস্কারাদীর মাধ্যমে মানুষ ক্রমেই পরস্পর নিকটতর হচ্ছে। এক দেশের আবিস্কারে হাজার হাজার মাইল দূরের অন্যান্য দেশের অধিবাসীরাও লাভবান হচ্ছে। পারস্পরিক যোগাযোগ যেখানে উন্নতির দুয়ার খুলেছে, সেখানে অনিষ্টকর বিষয়গুলোও একে অন্যের কাছ থেকে দ্রুত গ্রহণ করছে। অনিষ্টকর বিষয়াবলী বা বৃথা আনন্দ ফূর্তির মধ্যে আকর্ষণ বেশী থাকার কারনে তা মানুষকে নিজের দিকে বেশী আকৃষ্ট করে। এজন্য মানুষ এগুলো দ্রুততার সাথে ও তীব্রভাবে আপন করে নেয়। অর্থাৎ এগুলো শীঘ্র গ্রহণ করে এবং কখনো কখনো এ কারনে এক ধরনের উন্মাদনাও সৃষ্টি হয়। তখন সে ভুলে যায় সে কে? সে কোন পথের অনুসারী? কোন সমাজে তার উত্থান হয়েছে? তার সম্পর্ক কোন ধর্মের সাথে? কোনটি খোদা তাআলার পছন্দ আর কোনটি অপছন্দ? সে যদি মুসলমান হয়ে থাকে তবে খোদা তাআলা তার সৃষ্টির কি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন তা ভুলে যায়? মোট কথা পার্থিব মোহে পতিত হবার কারনে এবং আধুনিক হবার শখে অনেক ভুল বিষয়ও ভাল ধর্মীয় বোধ সম্পন্ন এক ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত হয়ে যায়। এমনকি কিছু সংখ্যক আহমদীও তুচ্ছ বিষয় মনে করে এধরনের কিছু বৃথা কাজে লিপ্ত হচ্ছে, যার পরিনাম খুবই খারাপ হতে পারে। এসব মন্দ কাজের মাঝে একটি হচ্ছে শির্ক যা অভাবনীয় ভাবে মানুষকে তার আঁচলে বেঁধে ফেলে। আল্লাহ্ তাআলার কাছে এটি শুধু অপছন্দনীয়ই নয় বরং অনেক বড় ও ক্ষমার অযোগ্য গুণাহ। যেমন খুতবার প্রারম্ভে আমি যে আয়াত পাঠ করেছি তাতে বলা হয়েছে, খোদা তাআলার তৌহিদ (একত্ব) বিরোধী যে কোন আচরণ, তা অত্যন্ত ক্ষুদ্র হলেও আল্লাহ্‌র কাছে অপছন্দনীয়।

সুতরাং একজন মুসলমান যে নিজেকে তৌহিদে বিশ্বাসী বলে দাবী করে, যে কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করে, তাকে তৌহিদকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে এই উন্নত বিশ্বে যেখানে খোদা তাআলার একত্বের প্রতি মানুষের বিন্দু মাত্রও বিশ্বাস নেই, সেখানে শির্ককে গভীরভাবে উপলব্ধি করে খুব সতর্ক পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। বিশেষ ভাবে আমাদের আহমদী মুসলমানদের সর্বদা এটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন, আমরা যুগ ইমামের হাতে এ শর্তে বয়আত করেছি এবং যে শর্তটি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) সর্ব প্রথম শর্ত হিসেবে রেখেছেন যার শব্দাবলী হচ্ছে-"বয়আত গ্রহণকারীকে সর্বান্তকরনে এ অঙ্গীকার করতে হবে যে, সে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্ক থেকে আত্মরক্ষা করবে।"

সুতরাং আহমদীয়াতে অন্তর্ভূক্ত হবার জন্য অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামে প্রবেশের জন্য এটি প্রথম শর্ত। কেউ বলতে পারে, মুসলমানরা তো পূর্ব থেকেই কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করে। এর উত্তর হল যদিও তারা কলেমা পাঠ করে, তথাপি আহমদীয়াত যেভাবে মুসলমানদেরকে প্রকৃত ইসলাম শেখাবে তেমনি অমুসলমানদের, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের এবং নাস্তিকদেরও প্রকৃত ইসলামের দিকে ডাকবে। এজন্য শিরকের শর্তটি প্রথম শর্ত যে কখনো শির্ক করবে না। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' - যে কলেমা এক মুসলমান সর্বদা পাঠ করে, যদিও এটি খুব কঠিন ও শক্ত ভাবে শিরককে নিষেধ করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই মুসলমানদের মধ্যে ঐ শিরক যাকে শিরকে খাফি (গোপন ও সূক্ষ্ম শির্ক) বলা হয়, সেটির প্রতি মোটেও ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। এটা বলা খুবই সহজ যে মুসলমানদের মধ্যে জামাতে আহমদীয়াতে যারা অন্তর্ভূক্ত হয়েছে তাদের জন্য এটি কোন বড় শর্ত নয়। কিন্তু ভেবে দেখুন, মুসলমানদের মধ্যেও অনেকে এমন রয়েছে যারা প্রকাশ্য শির্ক না করলেও গোপন শিরকে নিপতিত। তাদের এক দল মাথা ঠেকিয়ে কবর পূজা করছে, কবরে গিয়ে সিজদা করছে, সেখানে অন্যরা যদি সিজদা নাও করে, কিন্তু কবরে লালসালু চড়িয়ে হৃদয়ে গোপন শিরক ধারন করছে। তৃতীয় আরেক ধরনের লোক রয়েছে যারা কবরে গিয়ে দোয়া করে, আর দোয়া করতে গিয়ে খোদার পরিবর্তে যাদের কবরে গিয়ে তারা দোয়া করছে, ঐসব পীর ফকিরদের কাছে দোয়া প্রার্থনা করে। এমন কিছু ঘটনাও রয়েছে, মহিলারা বলে আমরা খোদা তাআলার নিকট পুত্র সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেছি, কিন্তু পুত্র সন্তান জন্ম হয় নি। কিন্তু যখন দাতার দরবারে গিয়ে দাতা সাহেবের কাছে চেয়েছি তখন ছেলে জন্ম হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেহেতু নারীরা ঈমানের দিক থেকেও দুর্বল হয়ে থাকে এবং সাধারণ ভাবে মুসলমানরাও যেহেতু এখন নামায ও ইবাদতে অমনোযোগী, তাই বিশেষ ভাবে নারীরা এবং সাধারণত পুরুষরাও এমন ঘটনার পর খোদা তাআলার প্রতি ঈমানে দুর্বলতা দেখায়। কখনো কখনো (ঈমান) সম্পূর্ণ বিনষ্টই হয়ে যায়। অতঃপর এসব লোকেরা হযরত দাতা গঞ্জ বখশ্ অথবা অন্য কোন পীর ফকীরের উপর খোদা অপেক্ষা বেশী ভরসা ও বিশ্বাস করতে থাকে।

নারী-পুরুষ উভয়েই এতে প্রায় সমান ভাবে জড়িত। পাঁচ বেলা নামায যেন এক ধরনের বোঝা, তাদের কাছে এথেকে সহজ পথ হচ্ছে কবরে গিয়ে দোয়া করে এবং মানত করে নিজের সমস্যা সমাধান করে নেয়া। যেহেতু বংশ পরম্পরায় ধারাবাহিক ভাবে এটি এক বংশ থেকে পরবর্তী বংশে সঞ্চালিত হচ্ছে, এজন্য খোদা তাআলার উপর ঈমান ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। মুসলমানদের মধ্যে এসব বিদাত দেখে একজন হিন্দুর দুঃসাহস হল এবং সে একটি কবিতা লিখে ফেলল। তাতে সে লিখল, আমরা যারা হিন্দু, যারা দেব-দেবতাদের পূজা করি, তেমনি মুসলমানরাও কবরে যায় এবং পীর ফকিরদের সিজদা করে, (এভাবে) তারা তাদের পূজা করছে।

সে (নাউযুবিল্লাহ) এতদূর বলেছে, তোমরা আঁ হযরত (সা.) কে খোদা বানিয়ে ফেলেছ। প্রকৃত পক্ষে এটি একটি জঘন্য অপবাদ এবং একজন প্রকৃত মু'মিনের উপর অত্যন্ত ঘৃন্য মিথ্যাচার। একত্ববাদ সম্বন্ধে আঁ হযরত (সা.) এর চেয়ে অধিক জ্ঞান কারো ছিল না এবং (ভবিষ্যতেও) কারো হবে না। তাঁর (সা.) চাইতে অধিক একত্ববাদ শিক্ষাদানকারী পূর্বে কেউ ছিল না এবং পরেও কেউ হবে না। একত্ববাদের ধারনা ও জ্ঞান লাভ করে মনে প্রানে সেটি বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে তাঁর (সা.) চাইতে অধিক অগ্রগামী আর কেউ ছিল না, আর কোন দিন হবেও না । তৌহিদের মর্ম সেই অনুধাবন করতে পারে যে খোদা তাআলাকে সব বিষয়ের উপর প্রাধান্য দেয়। এমন কোন ব্যক্তি কি আছে যে খোদা তাআলাকে তাঁর (সা.) চাইতে অধিক প্রাধান্য দিয়েছে এবং তাঁকে অর্জনের জন্য এমন অস্থির হয়েছে? তার নবুওয়াতের যুগের পূর্বের ইতিহাসই এ সাক্ষ্য দেয়, তিনি (সা.) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন নিভৃতে আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। তাঁর (সা.) একটি দোয়া খোদা তাআলার ভালবাসা অর্জনের জন্য তাঁর (সা.) আন্তরিক ইচ্ছা এবং অস্থিরতার কথা ব্যক্ত করে।

তিনি (সা.) তাঁর প্রভুর কাছে অস্থির হয়ে এ দোয়া করতেন, 'আল্লাহুম্মারযুকনী হুব্বাকা ওয়া হুব্বা মাই ইয়ানফাউনী হুব্বাহু ইনদাকা আল্লাহুম্মা মা রাযাকতানী মিম্মা উহিব্বু ফাজআলহু কুওয়াতুন লী ফি মা তুহিব্বু ওয়া মা যাওয়ায়তা আন্নী মিম্মা উহিব্বু ফাজআলহু ফারাগান লী ফী'মা তুহিব্বু' অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্! আমাকে তোমার ভালবাসা দান কর, এবং তার ভালবাসাও দান কর যার ভালবাসার মাধ্যমে আমি তোমার কল্যান লাভ করতে পারি। হে আল্লাহ্! আমার পছন্দনীয় জিনিষ আমাকে দান কর এবং এটিকে আমার জন্য দৃঢ়তার উপায় স্বরূপ বানাও, নিজ ভালবাসায় বৃদ্ধি পাওয়ার উপায় স্বরূপ বানাও, ঈমানে বৃদ্ধি পাওয়ার মাধ্যম বানাও। আমার প্রিয় জিনিষ থেকে আমাকে বঞ্চিত করলে তার পরিবর্তে নিজ পছন্দনীয় জিনিষ আমাকে দান কর'।

সুতরাং তিনি (সা.) আল্লাহ্ তাআলার কাছে শুধু খোদা তাআলার পছন্দনীয় জিনিষই যাচনা করেছেন এবং পৃথিবীতে আল্লাহ্ তাআলার পছন্দনীয় সব জিনিষের প্রতি যেন তার (সা.) ভালবাসা সৃষ্টি হয় সেজন্য তিনি (সা.) আবেগ ও ব্যাকুলতার সাথে প্রার্থনা করতেন এবং তা যেন তাঁকে (সা.) দ্বীনের দিক থেকেও অগ্রগামী করে এবং খোদা তাআলার ভালবাসায়ও বৃদ্ধি করে। সুতরাং কিছু লোক যারা এ কথা বলে বসে, আমরা পীর ফকীরদের কবরে এজন্য যাই যে তারা খোদা তাআলার প্রিয় ছিলেন, এ সম্বন্ধেও

কুরআন মজীদে উল্লেখ এসেছে যে এসব লোকদের তোমরা ব্যবহার করে থাক। যারা মূর্তিপূজা করে তারাও এ বাহানা পেশ করে যে আমরা এদের পূজা এজন্য করি যেন এদের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছতে পারি। এটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারনা। সুতরাং তারা পীর ফকিরদের কবরে গিয়ে যেসব দোয়া করে, যেগুলো যদি শিরক মুক্ত হয়ে থাকে, তবে এসব দোয়াকারীদের ঐসব পীর ফকিরদের জীবনাদর্শের উপর চিন্তা করে (যদি তারা প্রকৃতই পূণ্যবান হয়ে থাকে) তাদের এসব দোয়া খোদা তাআলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম হওয়া প্রয়োজন ছিল। এমটি তো হওয়া উচিৎ ছিল না যে উল্টো তাদেরকেই খোদা তাআলার বিপরীতে দাড় করিয়ে এটা বলতে আরম্ভ করে যে, এই ফকির আমাদেরকে সন্তান দিয়েছিল এবং এর ফলে অমুসলিমরাও ইসলামের উপর আপত্তি করার সুযোগ পেয়ে যায়, আঁ হযরত (সা.)-এর উপর আপত্তি করার সুযোগ পেয়ে যায়।

সাহাবীদের তরবিয়তের ব্যাপারে এবং তৌহিদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আঁ হযরত (সা.) এতটা যত্নবান ছিলেন যে, তিনি (সা.) বলেছেন, নগণ্য পরিমাণ লৌকিকতাও শির্কের অন্তর্ভূক্ত। যদি ইবাদতে তোমরা লৌকিকতা দেখাও তবে এটাও শির্ক।

তিনি (সা.) বলেছেন, 'তোমরা শির্ক থেকে বাঁচ, শির্ক পিপীলিকার পদচিহ্ন অপেক্ষাও গোপন। অর্থাৎ পিপীলিকা চলার ফলে ভূমিতে তার পায়ের যে চিহ্ন সৃষ্টি হয়, শির্ক তার চাইতেও সূক্ষ্ম। সাহাবাগণ জানতে চাইলেন, এথেকে কিভাবে বাঁচব? তিনি (সা.) এ দোয়া পাঠ করে বললেন, এটি পাঠ করবে, **'আল্লাহুম্মা ইন্না নাউযুবিকা মিন আন্ নুশরাকা বিকা শাইয়ান না'লামুহু ওয়া নাসতাগফিরুকা বিমা লা না'লামু'** অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্! আমরা জেনে বুঝে তোমার সাথে অংশীদার করা থেকে তোমার আশ্রয় চাই এবং অজ্ঞতা বশতঃ এরূপ করা থেকে তোমার করুনা প্রত্যাশী'। (মুসনাদ, আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদ আবু মূসা আশআরী, খন্ডঃ-৬, পৃষ্ঠাঃ-৬১৪-৬১৫)

একজন মুসলমানকে তিনি (সা.) সর্বদা শিরক থেকে বাঁচার আদেশ করেছেন। এজন্য সর্বদা তাদেরকে বলেছেন,'আমিতো একজন মানুষ মাত্র, দুর্বল মানুষ'। কেউ তাকে ভয় পাচ্ছে দেখে তিনি (সা.) বলেছেন, 'আমিতো এক সাধারণ নারীর সন্তান'।

খোদা তাআলাও তাঁর (সা.) দ্বারা এ ঘোষণা করিয়েছেন,'আনা বাশারুম্ মিসলুকুম' অর্থাৎ আমি তোমাদের ন্যায় এক সাধারণ মানুষ (সূরা কাহাফ ঃ ১১১)। অতএব ঐ হিন্দু ব্যক্তি (মুসলমানদের সম্পর্কে) এটি মিথ্যা লিখেছে যে, তোমরা আঁ হযরত (সা.) কে (নাউযুবিল্লাহ) খোদা বনিয়েছ যেভাবে আমরা আমাদের দেব-দেবীদের খোদা বানিয়েছি। বা কৃষ্ণ প্রভৃতিকে তারা খোদার মহা সম্মান দিয়েছে তো কি হয়েছে? কিন্তু তাদের এ কথাটি সত্য যে, তোমরা কবরকে খোদার মর্যাদা দিয়েছো।

সুতরাং মুসলমানদের এখন এটি ভাববার সময়, তৌহিদ প্রতিষ্ঠাকারীদের উপর শিরকের অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে। এ অভিযোগকে সাধারণ মুসলমানরা দূর করতে পারবে না। কিন্তু একজন আহমদী মুসলামানের কর্তব্য নিজেদের অবস্থা এবং কর্মে পরিবর্তন সাধন করা। নিজেদের ইবাদত সমূহ এমন উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করা যেন আমাদের ইবাদতে খোদা তাআলার তৌহিদ দৃষ্টিগোচর হয় এবং আমাদের কর্মেও যেন (তৌহিদ) দৃষ্টিগোচর হয়।

পৃথিবী বাসীকে বলে দিন, তৌহিদ প্রতিষ্ঠার জন্যই আঁ হযরত (সা.) আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর (সা.) শিক্ষা বাস্তবায়নের মাধ্যমেই এখন তৌহিদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যেহেতু এখন মুসলমানরা বিগড়ে গেছে, তাই এখন আঁ হযরত (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিক এবং সত্যিকার দাস হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জামাতে অন্তর্ভূক্ত হয়েই সত্যিকার অর্থে তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

অতএব এটি যেহেতু একজন আহমদীর দায়িত্ব এবং বয়আতের শর্তাবলীর প্রথম শর্ত এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যও এটিই যে, নিজ প্রভুর (আঁ হযরত সা. এর) পূর্ণ দাসত্ব করে তৌহিদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা, অতএব আমাদেরও কত সূক্ষ্ম সতর্কতার সাথে সর্ব প্রকার গোপন শির্ক থেকে বাঁচার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাদের নসিহত করে আল-ওসীয়্যত পুস্তকে বলেছেন, খোদা তাআলা চাচ্ছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সব সাধু প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যাক্তিদেরকে তৌহিদের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং তার ভক্ত দাসদেরকে এক ধর্মে একত্রিত করেন, তারা ইউরোপেই বাস করুক বা এশিয়াতেই বাস করুক। এটাই খোদা তাআলার অভিপ্রায় এবং এজন্যই আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি। সুতরাং তোমরা এই উদ্দেশ্যের অনুসরণ কর; কিন্তু বিনম্র ব্যবহার, নৈতিক উৎকর্ষ ও দোয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ সহকারে।'(আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, খন্ডঃ ২০, পৃষ্ঠাঃ ৩০৬-৩০৭)

সুতরাং একজন আহমদীর দায়িত্ব, আল্লাহ্ তাআলার এ ইচ্ছাকে অনুধাবন করুন। আল্লাহ্ তাআলার এ আদেশকে উপলব্ধি করুন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পন করেছেন সে সম্বন্ধে সজাগ হোন। যুগ ইমামের সাহায্য সহায়তাকারী হোন। সব কথা ও কাজের মাধ্যমে তৌহিদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করুন। শুধু মুসলমানদেরই নয়, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরও তৌহিদের দিকে আহ্বানের মাধ্যমে এক ধর্মে একত্রিত করার চেষ্টা করুন। এজন্য হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যে পদ্ধতি বর্ননা করেছেন অর্থাৎ, 'তোমাদের কথায় যেন নম্রতা থাকে এবং উত্তম চরিত্র যেন প্রকাশ পায়, যাতে তোমাদের চরিত্র দেখে লোকেরা আকৃষ্ট হয়, আর সর্বাগ্রে দোয়ার উপর প্রাধান্য দাও' এটি সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, কিছু বিদাত যখন প্রচলিত হয় তখন মানুষকে তা (ধর্মের) মূল শিক্ষা থেকে দূরে নিয়ে যায়। অতঃপর খোদা তাআলার প্রেরিত মূল শিক্ষাকে মানুষ ভুলে যায়। এ বিদাত প্রায়শঃই, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মকে নষ্ট করে এবং মানুষকে আল্লাহ্ তাআলার বিরুদ্ধে দাড় করিয়ে দেয়। পূর্বের সব ধর্ম নিজের প্রকৃত শিক্ষাকে এজন্যই হারিয়ে বসেছে যে তাদের মধ্যে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন নতুন বিদাত সৃষ্টি হয়েছে এবং এগুলোকে দূর করার জন্য কেউ আসেনি এবং আসার কথাও ছিল না। কেননা ইসলামই কেয়ামত পর্যন্ত তার প্রকৃত-রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকার ছিল। যিনি

আসার ছিলেন তিনি শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.), যিনি প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে সব ধরনের বিদাত এবং প্রচলিত ধর্মের ভুল প্রথা-প্রচলন সমূহকে দূর করার ছিলেন। যদিও দুর্ভাগ্যজনক ভাবে কিছু মুসলমানদের মাঝেও বিদাত সমূহ প্রচলিত হয়েছে এবং এমনই কিছু বিদাত এবং ভুল-ভ্রান্তি থাকার কারনে (মুসলমানদের মাঝে) শিরকও প্রবেশ করেছে। শুধু গোপন শিরকই নয় বরং কিছু স্থানে বাহ্যিক শিরকও আমরা দেখতে পাই। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা নিজ অঙ্গীকার অনুযায়ী এ যুগের ইমামকে প্রেরণ করে এ শিরক ও বিদাত থেকে ইসলামকে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করেছেন এবং ইনশাল্লাহ তাআলা এটি সুরক্ষিত থাকবে।

ইসলামে এবং মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হওয়া এসব বিদাত এবং ভুল প্রথা-প্রচলনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন," আমাদের পথ মূলতঃ তাই যা আঁ হযরত (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরামদের (রা.) পথ ছিল। বর্তমানে ফকীরগণ বেশ কিছু বিদাত সৃষ্টি করেছে। চিল্লা, জপ করা এবং ওজিফা প্রভৃতি তারা প্রচলন করেছে, আমরা এগুলো পছন্দ করি না।

গভীর অভিনিবেশসহ কুরআন মজীদ পাঠ করা এবং তাতে যেসব আদেশ আছে তা পালন করা, মনোযোগ দিয়ে নামায আদায় করা, আল্লাহ্‌র প্রতি বিনত হয়ে একাগ্রচিত্তে দোয়া করতে থাকা - এসব হচ্ছে সত্যিকার ইসলামের পথ। সুতরাং নামাযই হচ্ছে ঐ বস্তু যা মেরাজের (খোদার সাথে সাক্ষাতের) উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দেয়। এটি থাকলে সব আছে (অর্থাৎ নামায থাকলে সব কিছু আছে)।"

সুতরাং সাধারণ বিদাতের কথা পৃথক থাক, ওজিফা প্রভৃতি করা এবং এ ওজিফা সমূহের উপর ভরসাকারীদের আমলকেও হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বিদাত সৃষ্টিকারী আখ্যায়িত করেছেন। কেননা এসবের দরুন মূল শিক্ষাকে মানুষ ভুলে যায়। প্রকৃত ইবাদত-নামাযকে মানুষ ভুলে যায়। এটা ভুলে গিয়ে তারা জপ করা এবং ওজীফা পড়াকে প্রাধান্য দিতে শুরু করে। অতঃপর এটিও শয়তানী কাজ কর্মের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়।

এক বুযুর্গের কাহিনী প্রচলিত আছে, তার এক বোন ছিল যে খুব নেক, নামাযী, তাহাজ্জুদ গুযার এবং অন্যান্য নফল আদায়ে খুব যত্নবান ছিল। কোন মজলিশে গিয়ে বা অন্য কোন ভাবে প্রভাবিত হয়ে সে জপ করা, জিকর করা এবং ওজীফা পড়ার দিকে অধিক মনোযোগ দেয়া শুরু করলো। সে সেদিকে অধিক ঝুকে গেলো, অতঃপর ধীরে ধীরে দিনের নফল সমূহ ছেড়ে দিলো। ঐ বুযুর্গের মনে সন্দেহ হল এবং তিনি তার বোনকে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন উত্তরে তার বোন বললো, হ্যাঁ আমি এখন খুব জপ করছি ও ওজীফা পড়ছি। তিনি তাকে বোঝালেন, এটা ভুল পথ। কিন্তু সে তার কথা শুনলো না এবং ধীরে ধীরে তাহাজ্জুদ নামায পড়াও ছেড়ে দিলো। সেখানেও যিকির শুরু হয়ে গেল। তিনি (বুযুর্গ) বললেন,'দেখো! তুমি যে যিকির করছ, তোমাকে শয়তান প্রতারিত করছে। এজন্য এথেকে বাঁচ, এটা খোদার কোন আদেশ নয়। যদি তুমি এথেকে বাঁচতে চাও তবে লা হাওলা পড়, তবে তুমি বেঁচে যাবে। কিছু দিন পর বুযুর্গ মহিলার খেয়াল হল যে ফরয নামাযের প্রতিও তার মনোযোগ কমে যাচ্ছে। তখন তিনি নিজেই তার অবস্থা সম্বন্ধে সজাগ হলেন।

এরপর তিনি শয়তানের প্রতারণা থেকে বাঁচার জন্য **'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'** পাঠ করা শুরু করলেন। অতঃপর ধীরে ধীরে তার নামাযের দিকে মনোযোগ এবং একাগ্রতা সৃষ্টি হল। এরপর তাহাজ্জুদের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হল। অতঃপর নফল সমূহের প্রতিও মনোযোগ সৃষ্টি হল। কিছু কিছু বিষয়ে মানুষের পূর্ণ ধারনা থাকে না। এসব করে সে মনে করে আমি পূণ্য কাজ করছি, এ পুণ্য কাজে অনেক লাভ হবে। জপ করা এবং ওজীফা পড়া প্রভৃতি করে অনেক বড় মর্যাদা অর্জন হতে পারে।

এটি খুব ভাল কথা, যিকির করা প্রয়োজন, যিকরে ইলাহী দ্বারা জিহ্বা সিক্ত রাখা প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা যা আবশ্যক করেছেন এবং আঁ হযরত (সা.) আমাদের সামনে তাহাজ্জুদ ও নফল সমূহের যে সুন্নত প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেগুলো পূর্ণ করার পর। অবশ্যক এ বিষয়গুলোর সাথে সাথে যদি এসব (যিকির প্রভৃতি) থাকে, তবে ঠিক আছে। কিন্তু শুধু একটি বিষয়ের প্রতি জোর দেয়া এবং মূল দায়িত্ব ত্যাগ করা, সুন্নত ত্যাগ করা ভুল পদ্ধতি।

অতএব সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, 'আল্লাহু' এর মজলিশ, যিকির আযকার-এর মজলিশ নিঃসন্দেহে খুব পবিত্র মজলিশ। কিন্তু যখন এটি সীমাতিরিক্ত হয়ে যায়, তখন শয়তানের দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং সেটাই প্রকৃত পূণ্য যার আদেশ আল্লাহ্ দিয়েছেন। এবং তৌহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য এটি আবশ্যক। সুতরাং যেখানে বাহ্যতঃ পূণ্য কাজে আগ্রহ সৃষ্টিকারী বিষয়গুলোই কখনো কখনো বিদাত হয়ে যায়, সেখানে অন্যান্য বিদাততো অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করে। সাধারণ বিদাতগুলোতো সমাজে মন্দ প্রভাব সৃষ্টি করেই, আর বাহ্যতঃ যে সব বিদাত পূণ্যের দিকে ধাবিত করে বলে মনে হয়, এগুলো মানুষকে আবশ্যক দায়িত্ব পালন করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করে।

সুতরাং এ বিষয়ে একজন আহমদীর খুব সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। নিজের ফরয, নফল, তাহাজ্জুদ প্রভৃতি অতীব জরুরী বিষয় যেগুলো সম্বন্ধে আঁ হযরত (সা.) আমাদের আদেশ করেছেন এবং যেসব সুন্নত তিনি (সা.) আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন (সেগুলো পূর্ণ রূপে আদায় করতে হবে)। এরপর দোয়া এবং যিকির আযকার করবে। তখনই একজন মানুষ সত্যিকার বিশ্বাসী হওয়ার পথে পদক্ষেপ নেয়। এ সমাজে এক আহমদীর বিদাত থেকে বাঁচার জন্য জিহাদ রূপে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

প্রারম্ভে আমি উল্লেখ করেছি, নতুন নতুন আবিস্কারাদী কিছু মন্দ বিষয় বিস্তারেও বড় ভূমিকা রাখছে। চিন্তা ভাবনা না করেই কিছু লোক নিজেও এবং নিজেদের বাচ্চাদেরও এসব মন্দ বিষয়ে জড়িয়ে ফেলে। অথচ তাদের ধারনাই নেই যে এর প্রকৃত তাৎপর্য কী? এর অন্তর্নিহিত মর্ম কী? দেখাদেখি সমাজের পিছু পিছু চলে এরা এসব কাজ করতে শুরু করে। আঁ হযরত (সা.)-এর শেখানো এ দোয়ার দিকে যদি আমাদের দৃষ্টি থাকে,'হে আল্লাহ্! আমরা অজ্ঞতা বশতঃ কিছু কাজ করে ফেলি, সেগুলো করা থেকেও আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি'। সৎ সংকল্পের সাথে যখন এ দোয়া করা হয়,

তখন আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমা লাভ হয়। ভবিষ্যতের কিছু মন্দ বিষয় থেকেও মানুষ তখন রক্ষা পায়।

সুতরাং এসব অনিষ্টকর বিষয়াদী যা বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বে ধুম ধামের সাথে পালন করা হয়, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেও একটি পালন করা হবে, আমি তার কথা উল্লেখ করতে চাই। এটি হেলোইন (halloween) নামী একটি প্রথা। যেমন আমি বলেছিলাম, আহমদীরাও চিন্তা ভাবনা না করে নিজেদের বাচ্চাদের এতে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দিয়ে দেয়। অথচ বিষয়টির গভীরে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এটি খৃষ্টানদের মধ্যে উদ্ভুত একটি বিদাত যা শিরকের দোরগোড়ায় যায়। ডাইনী, জিন, শয়তানী কাজ প্রভৃতি থেকে বাইবেলও নিষেধ করে।

কিন্তু খৃষ্টানদের মধ্যে এটি প্রচলিত হয়ে গেছে। কেননা তারা (বাইবেলের শিক্ষার উপর) আমল করে না। সাধারণত বাচ্চাদের শখ ভেবে এটি করার অনুমতি দিয়ে দেয়া হয় এবং এটিকে fun মনে করা হয়। সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, ঐসব fun যার ভিত্তি শির্ক বা কোন প্রকার অনিষ্টের উপর হয়, চাই সেটাকে fun মনে করা হোক, তা থেকেও আহমদীদের বাঁচতে হবে। এ বিষয়ে তখন আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় যখন আমাদের রিসার্চ টিমের একজন ইনচার্য বললেন যে, তাকে তার মেয়ে বলেছে, halloween এ আমি অন্য কিছু করবো না, শুধু এতটুকু অনুমতি দিন যে সেই বিশেষ পোষাক প্রভৃতি পরিধান করে একটু ঘুরে বেড়াবো। ছোট বাচ্চা হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিষেধ করলেন।

এরপর এ বিষয়ে তিনি যখন বিস্তারিত রিসার্চ করলেন তখন কিছু বিস্ময়কর সত্য সামনে আসল। তখন আমি তাকে বললাম আমাকে কিছু উদ্ধৃতি দিতে। আমি যা পড়েছি তার সারাংশ আপনাদের সামনে বর্ণনা করছি। কারন অধিকাংশ বাচ্চারা চিঠির মাধ্যমে আমার কাছে প্রশ্ন পাঠাতে থাকে যে halloween এ অংশ নিলে ক্ষতি কি? আমাদের পিতা মাতা আমাদের এতে অংশ নিতে দেয় না, অথচ অন্য কিছু আহমদী পরিবারের বাচ্চারা তাদের পিতা মাতার অনুমতি নিয়ে এতে অংশ নেয়। তখন আমি এ সম্বন্ধে আমার যতটুকু জানা ছিল তা থেকে তাদের এ উত্তর দিতাম, এটি অনিষ্টকর এবং অপছন্দনীয় কাজ। আমি তাদের এ থেকে বিরত থাকতে বলতাম। কিন্তু এখন এর যে ইতিহাস সামনে এসেছে, সেই প্রেক্ষিতে প্রত্যেক আহমদী সন্তানের এ থেকে বিরত থাকা একান্ত আবশ্যক।

খৃষ্টানদের মধ্যে বা পশ্চিমা বিশ্বে এ প্রথা ও বিদাত এক আইরিশিযম এর কারনে এসেছে। তাদের মাঝে পুরনো যুগে pagan দের মধ্যে অধর্মের যুগে এটির প্রচলন হয়। শয়তানী এবং ডাইনী বিশ্বাসের উপর এর ভিত্তি রচিত। এসব বিশ্বাস ধর্ম ও ঘরের পবিত্রতাকে ধূলিস্যাত করে দেয়। যতই বলুন যে এটি তামাশা মাত্র, এর ভিত্তি মিথ্যার উপর। শুধু তাই নয়, এর মধ্যে শিরকও অন্তর্ভূক্ত। কেননা এর মূল বিশ্বাস হচ্ছে, জীবিত ও মৃতদের মধ্যে যে সীমারেখা আছে তা ৩১শে অক্টোবর শেষ হয়ে যায়। ঐ দিন মৃতরা জীবিতদের জন্য বাইরে বেরিয়ে এসে ভয়ানক রূপ ধারন করে এবং জীবিতদের জন্য নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি করে। রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত করে। এ ধরনের উদ্ভট ধারনা প্রচলিত আছে।

এদের (মৃত আত্মাদের) অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এরা এদের নামধারী জাদুকরদের ডেকে আনে যারা তাদের কাছ থেকে পশু ও ফসল নিয়ে এক বিশেষ পদ্ধতিতে কুরবানী করে। bon-fire ও এ বিশ্বাসেরই অন্তর্গত, যাতে করে একাজের মাধ্যমে এসব মৃত আত্মাকে ভীতি প্রদর্শন করে বা কিছু কুরবানী দিয়ে তাদের খুশি করে এসব (ধংসাত্মক) আচরণ থেকে বিরত রাখে। ভীতি প্রদর্শনের জন্য বিশেষ ধরনের পোষাক প্রভৃতি বানানো হয়, মুখোশ প্রভৃতি পড়া হয়। যাইহোক, পরবর্তীতে খৃষ্ট ধর্ম যখন বিস্তার লাভ করে, তারাও এসব প্রথা-প্রচলন গ্রহণ করে এবং এটিকেও তারা তাদের ধর্মীয় উৎসবের সাথে অন্তর্ভূক্ত করে পালন শুরু করে। বিশেষভাবে ক্যাথলিকরা এটি ঘটা করে পালন করে।

এ প্রথা এখন খৃষ্টধর্মের বদৌলতে ও প্রচার মাধ্যমের দ্বারা এবং পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে প্রায় সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ ভাবে পশ্চিমা বিশ্ব, আমেরিকা, কানাডা, যুক্তরাজ্য, জাপান, নিউজিল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপের বেশ কিছু দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। যেভাবে আমি বলেছি, এটি গোপন অনিষ্টকর বিষয়। পশ্চিমা বিশ্বে বসবাসরত মুসলমানরাও এটিকে গ্রহণ করেছে। বাচ্চারা বিভিন্ন ধরনের পোষাক পরে ঘরে ঘরে যায়। ঘরের লোকদের থেকে কিছু (জিনিষ) আদায় করে যেন (এসবের মাধ্যমে) মৃত আত্মাদের শান্তি পৌঁছানো যায়। অর্থাৎ ঘরের লোকদের এসব বিভিন্ন আকৃতির পোষাক পরিহিত বাচ্চাদের কিছু দেয়ার অর্থ হচ্ছে এখন মৃতরা এ ঘরের কোন প্রকার ক্ষতি করবে না। এটা এক প্রকার শিরক। আপনারা যতই এটাকে তামাশা বা এক প্রকার ফুর্তি বলুন, কিন্তু এর পেছনে যে বিশ্বাস রয়েছে তা শিরক যুক্ত। আশ্চর্য ও অ দ্ভুত ধরনের বেশ ধারন করা এবং ঘরে ঘরে গিয়ে ফকিরের ন্যায় হাত পাততে থাকা, এগুলো এমনিতেও এক আহমদী বাচ্চার জন্য শিষ্টাচার বিরোধী।

তারা যতই বলুক যে আমরা চকলেট নেয়ার জন্য গিয়েছিলাম বা অমুক জিনিষ চাইতে গিয়েছিলাম, কিন্তু এ ধরনের চাওয়াও অন্যায়। আহমদীদের মধ্যে শিষ্টাচার থাকা প্রয়োজন এবং শৈশব থেকেই (বাচ্চাদের) মাথায় এটি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এসব জিনিষ ধর্ম থেকেও দূরে নিয়ে যায়। যাই হোক এসব অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে প্রমান করা হয় fun করার জন্য-'ডাইনীদের অস্তিত্ব, মন্দ আত্মাদের অস্তিত্ব, শয়তানের পূজা প্রভৃতি অ-প্রাকৃত জিনিষের উপর সাময়িক বিশ্বাস করায় কোন আপত্তি নেই'।

এটি ভয়ানক ভুল ধারণা। এগুলো সবই শয়তানী কার্যকলাপ। এগুলো থেকে আমাদের বাচ্চাদের বেঁচে চলতে হবে, বরং দৃঢ়তার সাথে পরিহার করতে হবে। নিকট অতীতেও গ্রাম্য লোকেরা, তাদের দরজায় যেসব বাচ্চারা এসে চাইতো, এ বিশ্বাসে তাদের কিছু দিয়ে দিত যে মৃত আত্মারা যেন তাদের কোন ক্ষতি করতে না পারে।

যাই হোক, যেহেতু বাচ্চারা এবং তাদের পক্ষ থেকে বড়রাও জিজ্ঞাসা করতে থাকে, এজন্য আমি বলছি এটি একটি বাজে প্রথা।

এমন প্রথা যা শিরকের দিকে নিয়ে যায়। এসবের কারনে বাচ্চাদের মধ্যে fun এর নামে, হাসি তামাশার নামে ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করার সাহস সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে তারা (বাচ্চারা) পিতা মাতা ও প্রতিবেশীদের সাথেও অসদাচরণ করতে শুরু করে। এজন্যই তাদের মধ্যে পিতা মাতার সাথে, প্রতিবেশীদের সাথে, চারপাশের লোকদের সাথে এবং বড়দের সাথে অসদাচরণ করার প্রবনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা এক দুশ্চিন্তার বিষয়। এমনকি অন্যান্য অপরাধও এজন্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব আচরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে (অপরাধের) সাহসও সৃষ্টি হচ্ছে। বাচ্চাদের অধিকার এবং fun এর নামে পশ্চিমা বিশ্বে এসব অনিষ্টকর বিষয়ও 'সংবিধিবদ্ধ অধিকার' বলে ধার্য করা হয়েছে, তারা এসবের অনুমতি পেয়ে যায় এবং পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখন এরা নিজেরাও এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে শুরু করেছে। কেননা এদ্বারা চরিত্র ধ্বংশ হচ্ছে।

এরপর halloween বিরোধীরা এটাও বলছে, এ থেকে বাচ্চাদের মধ্যে হাসি তামাশার নামে অন্যদের ভীতি প্রদর্শন এবং আতংকিত করার মন্দ প্রবণতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এজ ন্য অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে। চলচিত্রসমূহ তো তাদের ভুল তরবিয়ত করছেই, আবার বাস্তবেও যদি তারা এসব মন্দ আচরণে লিপ্ত হয় এবং এগুলোকে হাসি তামাশার নামে উৎসাহিত করতে আরম্ভ করে, তবে তা সমাজের জন্য কেবল ধ্বংশই ডেকে আনবে। এরপর আমাদের জন্য সবচেয়ে ভয়ানক বিষয়, মৃতদেরকে খোদার সমকক্ষ দাড় করিয়ে কিছু ভ্রান্ত কার্যকলাপের মাধ্যমে সেটি সংরক্ষণের শয়তানী পথ অবলম্বন করা হয়েছে।

অর্থাৎ এগুলোকে আল্লাহ্ তাআলার বিরুদ্ধে দাড় করিয়ে একটি শিরক প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। বাচ্চাদের উপঢৌকন দিয়ে আত্মাদের খুশি করা বা জাদুকরদের মাধ্যমে এদের ভয় দেখানো প্রভৃতি শিরকের অন্তর্ভূক্ত। যাইহোক এগুলো নিতান্তই বাজে কাজ এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস। ডক্টর গ্রেয কিটলম্যান নামে একজন আহমদী লেখক রয়েছেন, তিনি তার 'ইউর চাইল্ড প্রোবলেমস' গ্রন্থে লিখেছেন, যৌবনে পদার্পনের পূর্বে বা এর মধ্যবর্তী সময়ে শিশুদের জীবনে যে অচিন্তনীয় হতাশা জনক ও ভীতিকর অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে তা অ-প্রাকৃত জিনিষ গুলোর প্রতি আকর্ষণ ও এসবে লিপ্ত হওয়ার কারণে হচ্ছে।

এখন এ halloween এর কারণে কিছু কিছু বিষয় সৃষ্টি হচ্ছে। এটি শুধু বিভিন্ন প্রকার পোষাক পরিধান ও ঘরে ঘরে গিয়ে হাত পাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বড় বাচ্চারা বিভিন্ন বাড়ীর লোকদের জোর পূর্বক ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টাও করে এবং অপরাধমূলক অন্যান্য বিষয়েও লিপ্ত হয়। এর মাধ্যমে তারা সমাজ ও পরিবেশ নষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্থ করছে।

পিতা মাতার জন্যও দুশ্চিন্তার কারণ হচ্ছে, আবার নিজের জীবনও ধ্বংশ করছে। এজন্য আমি আহমদীদেরকে বলছি, এসব বিষয় থেকে সম্পূর্ন মুক্ত থাকা প্রয়োজন। আহমদী বাচ্চাগণ এবং বড়দের দায়িত্ব হচ্ছে আপনারা খোদা তাআলার সাথে সম্পর্কোন্নয়ন করুন। আমাদের উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করুন। ঐ সব কাজ করুন যেগুলো করার জন্য খোদা তাআলা আদেশ দিয়েছেন। নিজেদের মাঝে পশ্চিমা সমাজের প্রভাব এতটা পড়তে দেবেন না যাতে ভাল-মন্দের পার্থক্য মিটে যায় এবং খোদা তাআলার সাথে সম্পর্ক এবং তার সত্ত্বার মহত্ত্বকেই ভুলে বসেন এবং গোপণ শিরকে লিপ্ত হয়ে যান। এ কারনে প্রকাশ্য শিরকও হতে শুরু করে। আল্লাহ্ তাআলা সবাইকে এগুলো থেকে সুরক্ষিত রাখুন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন,'মানুষ খোদার উপাসনার দাবী করে, কিন্তু উপাসনা কি শুধুমাত্র অধিক সিজদা, রুকু ও কেয়াম (দাড়ানো) দ্বারা সম্ভব? অথবা অধিক সংখ্যায় তসবীহের পুথি গণনা কাউকে আল্লাহ্‌র ভক্ত বলে আখ্যায়িত করতে পারে? বরং উপাসনা তার দ্বারা হতে পারে যাকে খোদার ভালবাসা এত অধিক শক্তিতে নিজের দিকে আকর্ষণ করে যে মাঝখান থেকে তার নিজের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় এবং খোদার অস্তিত্বের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপিত হয়।

অতঃপর খোদার সৌন্দর্য ও অনুগ্রহের উপর পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় এবং তার সাথে এমন ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হয় যে ব্যাথাতুর ভালবাসা সর্বদা হৃদয়ে বিরাজমান থাকে আর প্রতি নিঃশ্বাসে চেহারাতে প্রতিভাত হয়। খোদার মাহাত্ম্য হৃদয়ে এমনভাবে স্থান দখল করে যে সমগ্র পৃথিবী তাঁর সত্ত্বার সামনে মৃতবৎ মনে হয় এবং শুধু তাঁর সত্ত্বাকেই সে ভয় পায়। তার (ভালবাসার) বেদনাতেই আনন্দ লাভ করে এবং তাঁর মিলনেই সুখ লাভ করে এবং তিনি ব্যাতীত আর কারো কাছে প্রশান্তি লাভ হয় না । যদি এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় তবে এর নাম উপাসনা। কিন্তু খোদা তাআলার বিশেষ সাহায্য ছাড়া এ অবস্থা কিভাবে সৃষ্টি হতে পারে? এজন্য খোদা তাআলা এ দোয়া শিখিয়েছেন,**'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন'** (সূরা ফাতেহা ঃ ৫)

অর্থাৎ আমরা তোমারই উপাসনা করি, কিন্তু উপাসনার হক আদায় করতে পারি কোথায়? যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার পক্ষ থেকে বিশেষ সাহায্য না আসে। খোদাকে নিজের প্রকৃত প্রভূ নির্ধারণ করে তার ইবাদত করাই হচ্ছে বিলায়েত (আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ) যার উপর আর কোন মর্যাদা নেই।

কিন্তু এ মর্যাদা তাঁর সাহায্য ছাড়া লাভ করা অসম্ভব। এটি অর্জিত হওয়ার চিহ্ন হচ্ছে খোদা তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব হৃদয়ে স্থান করে নেয় এবং হৃদয় তার উপরই ভরসা করে এবং তাকেই পছন্দ করে এবং প্রতিটি জিনিষের উপর তাকেই অবলম্বন করে। তার স্মরণই নিজ জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে। আর যদি ইবরাহীমের ন্যায় নিজ হাতে প্রিয় সন্তানকে কুরবানী করার আদেশ আসে, অথবা নিজ দেহ আগুনে নিক্ষেপ করার ইশারা হয়, তবে ভালবাসার তীব্র আবেগে এমন কঠিন আদেশকেও পালন করে। নিজ পবিত্র প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনে এমন চূড়ান্ত প্রচেষ্টা করে যে তার আনুগত্যে কোন ত্রুটি বাকী থাকে না ।

এটি খুব সংকীর্ণ দরজা এবং এ শরবত খুব তিক্ত শরবত। খুব কম লোকই আছে যারা এ সংকীর্ণ পথে প্রবেশ করে এবং এ শরবত পান করে। ব্যভিচার থেকে বাঁচা কোন বড় বিষয় নয় এবং কাউকে অন্যায় ভাবে হত্যা

না করা বড় কাজ নয়। মিথ্যা সাক্ষ্য না দেয়া কোন বড় বৈশিষ্ট্য নয়, কিন্তু সব জিনিষের উপর খোদাকে অবলম্বন করা এবং তাঁর সত্যিকার ভালবাসায় এবং সত্যিকার আবেগে পৃথিবীর সমুদয় তিক্ততাকে বরণ করে নেয়া, বরং নিজ হাতে তিক্ততা সৃষ্টি করা, এটা সেই মর্যাদা যা সিদ্দীকগণ ছাড়া কেউ লাভ করতে পারে না। এটাই সেই ইবাদত যা আদায় করার জন্য মানুষ আদিষ্ট হয়েছে। আর যে ব্যক্তি এ ইবাদত সম্পাদন করে তখন তার সেই কাজে খোদার পক্ষ থেকেও এক কাজ সম্পৃক্ত হয়। যার নাম পুরস্কার। যেমন আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমে এ দোয়া শিখিয়েছেন, 'ইহদিনাস সিরাত্বাল মুস্তাকীম, সীরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম'(সূরা ফাতেহা ঃ ৬-৭) অর্থাৎ হে আমাদের খোদা! আমাদেরকে তোমার সোজা সরল পথে পরিচালিত কর। তাদের পথে যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছ আর নিজের বিশেষ কৃপা দ্বারা ভূষিত করেছ। আল্লাহ্‌র বিধানে এ নিয়ম জারী আছে যে যখন সেবা গৃহীত হয় তখন আবশ্যক ভাবে তার জন্য কোন পুরস্কারও নির্ধারিত হয়। যেমন অলৌকিক কার্যাবলী এবং নিদর্শন সমূহ যা অন্যান্য সাধারণ লোকেরা লাভ করে না, এটাও খোদা তাআলার পুরস্কার যা তার বিশেষ বান্দাগণ লাভ করে। (হকীকাতুল ওহী, রুহানী খাযায়েন, খন্ডঃ২২, পৃষ্ঠা ঃ ৫৪-৫৫)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাদের কাছে যে সব প্রত্যাশা করেছেন তা যেন আমরা পূর্ণ করতে পারি এবং এ বিষয়ে প্রচেষ্টাকারী হতে পারি আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সে সৌভাগ্য দান করুন। নিজেরাও প্রচেষ্টা রত থাকুন। আমরা এ প্রচেষ্টায় রত থাকলে আল্লাহ্ তাআলা নিজ কৃপা বর্ষণ করবেন, ইনশাআল্লাহ । আল্লাহ্ তাআলা এমনটিই করুন। (আমীন)

অনুবাদ : **আলহাজ্ব মওলানা সালেহ্ আহমদ**
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।